বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় :
নির্জনতা থেকে উৎসারিত বিশ্ববোধের আধুনিকতা

মৃণাল ঘোষ

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের জন্মশতবার্ষিকী অতিবাহিত হয়েছে ২০০৪ সালে। সে উপলক্ষ্যে তাঁর সারা জীবনের কাজ নিয়ে প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে দিল্লির ন্যাশনাল গ্যালারি অব মডার্ন আর্ট-এ ৩০ ডিসেম্বর ২০০৬ থেকে ১১ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ পর্যন্ত। এর আগে তাঁর শিল্পকৃতির সামগ্রিক পরিচয় এত বিস্তৃতভাবে কখনও কোথাও তুলে ধরা সম্ভব হয়নি। এই প্রদর্শনীর মধ্য দিয়েই সারা দেশ এই মহান শিল্পীর শিল্পকৃতির বিস্তীর্ণ দিগন্তের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। এই প্রদর্শনী পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা বা কিউরেট করেছিলেন গুলাম মহম্মদ শেখ ও আর. শিবকুমার।

এই প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে ন্যাশনাল গ্যালারি দিল্লির ভাদেরা আর্ট গ্যালারির সহযোগিতায় প্রকাশ করেছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ একটি স্মারকগ্রন্থ বা ক্যাটালগ। এত বিস্তৃত ও এত উন্নত মানের প্রদর্শনী স্মারক আমাদের দেশে এর আগে আর হয়েছে কিনা বর্তমান লেখকের তা জানা নেই। শিল্পীর সারা জীবনের কাজ কালানুক্রমিকভাবে দেখার সুযোগ হয় ১২ X ৯.৫ ইঞ্চি মাপে ৩২১ পৃষ্ঠার এই বইতে। কিউরেটোরিয়াল নোট ছাড়া বিনোদবিহারীর জীবন ও শিল্পকৃতি সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে লিখেছেন কে. জি. সুব্রামনিয়ম, গুলাম মহম্মদ শেখ ও আর. শিবকুমার। শান্তিনিকেতনের শিল্পচর্চার প্রেক্ষাপটে বিনোদবিহারীকে সম্যকভাবে জানার জন্য এই ক্যাটালগ অসামান্য এক আকরগ্রন্থ। এই বইটির আলোচনা - এই লেখার প্রাথমিক উপলক্ষ্য, আর সেই সুযোগ এই শিল্পীকে যতটুকু সম্ভব বোঝার চেষ্টা।

।। দুই।।

সত্যজিৎ রায় 'ইনার আই' তথ্যচিত্রটি করার আগে বাংলার বাইরে এমনকি ভিতরেও বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের গুরুত্ব সম্পর্কে খুব কম মানুষই অবহিত ছিলেন। কে. জি. সুব্রামনিয়ন তাঁর একটি লেখায় বলেছেন, এই স্মারকগ্রন্থেও রয়েছে সেই লেখাটি, যে একবার বিনোদবিহারী সম্পর্কে একটি লেখা কলকাতার একটি প্রথম শ্রেণীর ইংরেজি দৈনিকে যখন ছাপার জন্য উপস্থাপিত করা হয়েছিল, তখন সেই পত্রিকার প্রাজ্ঞ সম্পাদক, চিনতেই পারেন নি, কে এই বিনোদবিহারী। এ প্রসঙ্গে সুব্রামনিয়ম মন্তব্য করেছেন, এই অনবধানতার জন্য বিনোদবিহারীর ব্যক্তিত্বের ধরনও অনেটা দায়ী। মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বা পাদপ্রদীপের আলোয় আসার মতো সমস্ত গুণই তাঁর ছিল। ছিল প্রখর ও আলোকিত ব্যক্তিত্ব। পাণ্ডিত্য ছিল। ছিল দীপ্ত রসবোধ। কথা বলতেন সুন্দর। কিন্তু তিনি সবসময়ই তাঁর চারপাশে নিভৃত আড়াল রাখতে চেয়েছেন, যার অন্তরালে তিনি নিজের কাজে নিমগ্ন থাকতে পারেন। নির্জনতা বা একাকিত্ব ছিল তাঁর চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য। এই তন্ময়তাই ছিল তাঁর সৃজনের উৎস। সত্যজিৎকে বলেছিলেন একবার, শান্তিনিকেতনের দিগন্তবিস্তৃত খোয়াইয়ের মধ্যে একা দাঁড়িয়ে থাকা নির্জন একটি তালগাছ, এই হল তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতীক। তাঁর সমস্ত কাজের ভিতর এই তন্ময়তা ও নির্জনতাকে অনুভব করা যায়। তবু আধুনিকতাবাদের পাদপীঠ তৈরির প্রধান এক স্থপতি হিসেবে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তাঁর স্বীকৃতি যে বিলম্বিত হয়েছে, তার কারণ তিনি নিশ্চয়ই নন। এজন্য দায়ী অন্য এক রাজনীতি। আধুনিকতার ইতিহাস গড়ে তোলার দায়িত্ব যাঁদের তাঁদের দৃষ্টির সংকীর্ণতা।

তাঁর ব্যক্তিত্বের এই নির্জনতা সারাজীবন ধরে তাঁর প্রায় ছবিতেই পরিস্ফুট হয়েছে। তাঁর ছবির প্রধান বিষয় ছিল নিসর্গ। নিসর্গকে জড়িয়ে অবয়বী ছবিও তিনি কম আঁকেন নি। কিন্তু বাইরের নিসর্গহীন কেবল নিজকে নিয়ে বা আত্মপ্র তিকৃতিমূলক ছবি খুব বেশি পাইনি তাঁর কাছ থেকে। সেজন্য এরকম একটি ছবির দৃষ্টান্তে তাঁর নির্জনতাকে আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করতে পারি। ছবিটির নাম 'আর্টিস্ট ইন স্টুডিও'। কাগজের উপর জলরঙে আঁকা ১৯৩৩ থেকে ৩৫ -এর মধ্যে। তখন তাঁর বয়স ২৯-৩০। কলাভবন সংগ্রহে রয়েছে এখন ছবিটি। শিল্পীর নিজের স্টুডিওর অভ্যন্তর। নিসর্গের আভাস একটুখানি মাত্র রয়েছে। ঘরের অন্য প্রান্তের দেয়ালে একটি খোলা জানালা। তা দিয়ে বাইরের সবুজ প্রান্তর দেখা যাচ্ছে। সেই নিসর্গ ঝাপসা। তাতে বিশদ কিছু নেই। ঘরের সামনের দিকে অর্থাৎ চিত্রক্ষেত্রের সম্মুখভাগে কিছু আসবাবপত্র ও আঁকার সরঞ্জাম ছড়ানো রয়েছে। অগোছালো নয়, পরিপাটি করে সাজানোই বলা যায়। কিন্তু তাদের রঙে, তাদের অবয়বেও স্মিত এক শান্ততা অনুভব করা যায়। একটি বড় হাতলওয়ালা বেতের চেয়ার রয়েছে। তার সামনে বাঁ-দিক ঘেঁষে মেঝের উপর আয়তাকার একটি ক্ষেত্রে কিছু যন্ত্রপাতি ছড়ানো। উপরের দিকে, ঘরের মাঝামাঝি অংশে একটি বসবার মোড়া, ছোট চৌকি। তারও উপরের দিকে ছড়ানো রং-তুলি পেরিয়ে দেওয়ালের প্রান্ত ঘেঁষে মেঝেতে বসে শিল্পী ছবি আঁকায় নিমগ্ন। তাঁর অবয়বের পার্শ্বচিত্র দেখা যাচ্ছে।

তাঁর তন্ময়তার কাছে বাইরে তাঁর প্রিয় প্রকৃতিও আবছা হয়ে গেছে। ঘরের অন্যসব আসবাব স্তিমিত। শুধু সম্মুখপটে বেতের চেয়ারটি তার নীরব অস্তিত্ব নিয়ে স্বরাট। শিল্পীর নিজস্ব আসন। তাঁর নিঃশব্দ তন্ময়তাকে ধরে রেখেছে। দূরে শিল্পী বসে ছবি আঁকছেন। তাঁর মগ্নতার সঙ্গে চেয়ারের মগ্নতার এক সংলাপ তৈরি হচ্ছে। সেই সংলাপই ছবিটির প্রাণ। হয়তো বা মূল উপজীব্য। আর এই একাকী তন্ময় সৃজনের নিমগ্নতা ছবির প্রধান বিষয় বা ভাব। এই ছবিতে শিল্পী তাঁর আত্মচেতনার যে প্রতিকৃতি গড়েন সেটাই তার সমগ্র শিল্পীচেতনার ভূমিকাস্বরূপ। এই নির্জনতার দর্শন দিয়েই তিনি আধুনিকতাবাদের বিশেষ এক ভাষ্য রচনা করবেন।

এই ছবিটিরই দুটি পূর্ব-পরিকল্পনা বা প্রাথমিক খসড়া দেখি এই স্মারকগ্রন্থে। দুটিতেই জানলা আছে। জানলা দিয়ে বাইরের নিসর্গ আছে। ১০ পৃষ্ঠার কালি-কলমের স্কেচটিতে শিল্পী বসে আছে চৌকির উপর। ঘরে আসবাবের বাহুল্য বিশেষ নেই। ১১ পৃষ্ঠার জলরংটিতে শিল্পীর নিজের উপস্থিতি নেই। সামনের দিকে বেতের চেয়ারটি রয়েছে তার স্পষ্ট অস্তিত্ব নিয়ে।

একটি টেবিল রয়েছে। তার উপর ঝালর দেওয়া টেবিল - ল্যাম্প। মেঝেতে স্টোভের উপর একটি পাত্র বসানো। ইত্যাদি...ইত্যাদি। প্রতিচ্ছায়াবাদী বা ইম্প্রেশনিস্ট আঙ্গিকের এই ছবিটিতে আলো উজ্জ্বলতর। নির্জনতায় ততটা মগ্নতা নেই। সেই মগ্নতা আনতেই চূড়ান্ত ছবিটিতে তিনি আলো কমিয়ে এনেছেন। আসবাবের বিন্যাসও পাল্টেছেন। প্রায় দু'বছর ধরে এই একটি ছবি আঁকতে গিয়ে তিনি নির্জনতার স্বরূপ খুঁজেছেন। এই নির্জনতার ভিতরই তিনি আত্মস্বরূপের প্রতিষ্ঠা করবেন।

এই নির্জনতার স্বরূপ নির্মাণের পথে তাঁর সূচনাপর্বের কয়েকটি ছবি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। 'লাফটার' শিরোনামে কাগজের উপর টেম্পারার ছবিটি তিনি এঁকেছিলেন ১৯২১ সালে। তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৭। কলাভবনে নন্দলালের ছাত্র। এঁকেছিলেন শরতে কাশফুলের ছবি। খোয়াইয়ের বুকে কাশফুল। তারপর স্বপ্ন দেখেছিলেন যেন ছবিটিতে তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন উজ্জ্বল লাল রং। স্বপ্ন থেকে জেগে সেই লাল রঙেই তিনি আপ্লুত করলেন ছবিটিকে। সূর্যাস্তের লালিমায় পরিব্যাপ্ত হল খোয়াই। এক অভিব্যক্তিবাদী উন্মত্ততা জেগে উঠলে ছবিটিতে। তাতে নির্জনতাই বিশেষ এক মাত্রা পেল। ১৯২৩ -এ তিনি তেলরঙে আঁকেন যে 'শিমূল' এর ছবি, তাতে থাকে ছায়াচ্ছন্নতা। সন্ধ্যার মগ্নতা। সেই মগ্নতায় ফুটে থাকে লাল শিমূল। ধ্যানের স্তব্ধতা ছড়িয়ে থাকে যেন অভিব্যক্তিবাদী অনুষঙ্গেই। ১৯২১ -এ সেই সূচনাপর্বের ছবির মধ্যে টেম্পারায় আঁকা 'বীরভূম সামার ল্যান্ডস্কেপ' ছবিটিও স্মরণীয়। এর মধ্যেও শিল্পীর ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ আদলটি ধরা আছে। দিগন্ত বিস্তৃত শুষ্ক প্রান্তর। একপ্রান্তে জোটবদ্ধ কয়েকটি খেজুরগাছ। রৌদ্রোজ্জ্বল প্রান্তর জুড়ে যে নীরব ধ্যানমগ্নতা, সেই মগ্নতাই ক্রমে প্রসারিত হবে তাঁর সারাজীবনের কাজে।

এই মগ্নতার স্বরূপ বুঝতে আমরা দেখে নেব তাঁর আরও দুটি ছবি। দুটিই ১৯৩২ এ আঁকা। কাগজের উপর টেম্পারায়। 'দ্য ব্রিজ' নিছক একটি সেতুর ছবি। একটি খাঁড়ি বা জলের উপরে ইটের স্তম্ভ। তার উপরে সেতু। কিছু গাছ উপরে ও নিচে। মৃদু আলোয় আবছায়া। তাতে সেতুটি আপন নির্জন অস্তিত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর কিছু নেই। অথবা এই শূন্যতার মধ্যেই রয়ে গেছে আরও কিছু। প্রকৃতির নিভৃত এক প্রাণ। 'দ্য ট্রি লাভার' ছবিটি তেজেশচন্দ্র সেনের প্রতিকৃতি। শান্তিনিকেতনে তেজেশচন্দ্র ছিলেন প্রকৃতির বা গাছপালার বিশেষ বন্ধু। তাঁরই প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে শিল্পী এঁকেছেন অভিব্যক্তিবাদী অন্যরকম এক প্রকৃতিচিত্র। শিমূল গাছের তলায় খড়ম পরে দাঁড়িয়ে আছেন আত্মমগ্ন মানুষটি। তাঁর পায়ের কাছে কয়েকটি সবুজ গুল্ম। পশ্চাৎপটে হাল্কা লাল আর হলুদের বুনোট। সহজ, সংবৃত প্রতিমাকল্পের ছবি।১৯৩২ সালে যখন এসব ছবি আঁকছেন বিনোদবিহারী, তখন অবনীন্দ্রনাথও এঁকে ফেলেছেন তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ ছবি। তারপর নীরব হয়ে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ এঁকে যাচ্ছেন অবিচ্ছিন্ন ধারায়। নন্দলাল করে ফেলেছেন তাঁর জীবনের অনেক শ্রেষ্ঠ কাজ। যামিনী রায় তাঁর পাশ্চাত্য পর্ব ছাড়িয়ে চলে এসেছেন লৌকিকের দিকে। রামকিঙ্করেরও যাত্রা শুরু হয়েছে প্রাচ্য - পাশ্চাত্যের সমন্বয়ের দিকে। সেই সময় বিনোদবিহারী সন্ধান করছেন স্বতন্ত্র এক রূপকল্পের। সন্ধান করছেন বললে ভুল হবে। তাঁর ব্যক্তিত্বের গড়ন রূপায়িত করছেন তিনি। আর সেই আত্মমগ্ন নির্জনতার ভিতর দিয়ে গড়ে তুলতে চাইছেন আধুনিকতার বিশেষ এক স্বরূপ, যেখানে প্রাচ্যচেতনা বিশেষ এক চালকশক্তি। নব্য-ভারতীয় ঘরানার পর্বে যে স্বদেশচেতনার সন্ধান চলছিল, তা অধিকাশংই অতীত ও পুরাণকল্পভিত্তিক। আত্মচেতনার প্রকাশ ছিল খুবই সীমিত। সেই শূন্য পরিসরে শুরু হল বিনোদবিহারীর সাধনা, আত্মমগ্ন নির্জনতার ভিতর দিয়ে প্রাচ্যচেতনার ভিত্তিতে আধুনিকতার স্ব রূপসাধন।

।। তিন।।

এই যে নির্জনতার বোধ, প্রকৃতির সৌন্দর্যের সাথে গভীরভাবে এবং আধ্যাত্মিক একাত্মতায় লিপ্ত থেকেও নির্জন হয়ে থাকা। এই আত্মমগ্নতা থেকেই গড়ে উঠেছিল তাঁর এক অর্ন্তদৃষ্টি। সত্যজিৎ রায় এরই নাম দিয়েছিলেন— 'ইনার আই তাঁর এই 'ইনার আই' যে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল তাঁর দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ চলে যাওয়ার পর— তা নয়। এই অন্তর্দৃষ্টি, যা তাঁর অর্ন্তমুখীনতারই প্রকাশ, তা সক্রিয় ছিল তাঁর শৈশব থেকেই। শৈশব থেকেই তাঁর অসুস্থতা, ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তি, গৃহবন্দি হয়ে থাকা, স্কুলে যেতে না পারা— এই সমস্তই তাঁকে অন্তর্মুখী করেছিল, তাঁর ভিতর একাকিত্বের অনুভব জাগিয়েছিল। এই নির্জনতার বোধই পরিণত বয়সে তাঁকে এক স্বতন্ত্র শিল্পদৃষ্টি দিয়েছিল।

বিনোদবিহারী তাঁর আত্মজীবনী 'চিত্রকার' -এ লিখেছিলেন, 'আমি জন্মেছিলাম সামনে লম্বা অনিশ্চিতের ছায়া নিয়ে। এই ছায়ায় আমাদের পরিবারের সকলের মন আচ্ছন্ন হয়ে ছিল অনেকদিন পর্যন্ত। সকলেরই চিন্তা কি হবে এই ছেলের।' শৈশবে তাঁর অসুস্থতা ও অতি ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তি ছিল এই অনিশ্চয়তা ও আশঙ্কার কারণ। চোখে ভালো দেখতে না পাওয়ার জন্য কোনও স্কুলে তিনি বেশিদিন থাকতে পারেননি। তবু পারিবারিক পরিবেশের জন্য পড়ার অভ্যাস তিনি আয়ত্ত করেছিলেন ছেলেবেলা থেকে। এই পড়ার অভ্যাসই তাঁকে শেষ পর্যন্ত রক্ষ করেছিল। তাঁর ভিতর নতুন চেতনার জন্ম দিয়েছিল। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর এবং যথেষ্ট মেধাবীও ছিলেন তিনি। এই মেধা তাঁকে প্রচলিত পথের বাইরে নতুন পথ দৈরিতে প্রাণিত করেছে। তখনকার নব্য-ভারতীয় ঘরানার পরিমণ্ডলের মধ্যে বড় হয়েও নন্দলাল বসুর সান্নিধ্যে থেকেও, তিনি স্বদেশচেতনার প্রচলিত পথ থেকে বেরিয়ে এসে অথচ স্বদেশচেতনাতেই সমগ্র বিশ্বাস স্থাপন করে চিত্রচর্চার নতুন এক পথ বের করে এনেছেন, তাঁর মেধাই এজন্য দায়ী। আর প্রখর স্মৃতিশক্তির কারণেই অন্ধ হয়ে যাওয়ার পরেও তিনি এত শিখতে পেরেছেন। শিল্প ইতিহাসে অসামান্য পাণ্ডিত্য অর্জন করতে পেরেছেন।

তাঁর শিল্পদৃষ্টি গড়ে ওঠার জন্য বিনোদবিহারী তিনটি বিষয়কে গুরুত্বপূর্ণ বলে চিহ্নিত করেছেন। 'চিত্রকর' বইতে লিখেছেন (পৃ. ৩৬) : 'তাই ভাবি আমি শিখলাম কার কাছ থেকে? নন্দলালের কাছ থেকে, না লাইব্রেরি থেকে, অথবা শান্তিনিকেতনের এই রুক্ষ প্রকৃতি থেকে?' তারপর উত্তর দিয়েছেন নিজেই। 'নন্দলাল না থাকলে আমার আঙ্গিকের শিক্ষা হতো না, লাইব্রেরি ছাড়া আমার জ্ঞান আহরণ সম্ভব হতো না, আর প্রকৃতির রুক্ষ মূর্তি উপলব্ধি না করলে আমার ছবি আঁকা হতো না।'—তাঁর

ব্যক্তিগত নির্জনতার বোধের সঙ্গে 'প্রকৃতির রুক্ষ মূর্তি মিলে তাঁর প্রকাশভঙ্গি বা আঙ্গিকের স্বরূপ নির্ধারণ করেছে। এর উপরে আলোর মতো কাজ করেছে আর একটি উৎস, রবীন্দ্রনাথ। বলেছেন : 'রবীন্দ্রনাথের কাছে আমি যদি কিছু না পেয়ে থাকি তবু আমি বলব তিনিই আমার নবজন্মদাতা'। এটা শুধু এজন্য নয় যে রবীন্দ্রনাথের নির্দেশেই তাঁর দৃষ্টিশক্তির সমস্যা সত্ত্বেও নন্দলাল তাঁকে কলাভবনে ভর্তি করতে রাজি হয়েছিলেন। তার চেয়েও বড় কথা রবীন্দ্রনাথ জীবনবোধের ও শিল্পবোধের যে আদর্শ স্থাপন করেছিলেন, সেই আদর্শই বিনোদবিহারীকে উদ্বুদ্ধ করেছিল শিল্পের এক নতুন পথ তৈরি করতে যে পথ সেই সময়ে শান্তিনিকেতনে বা কলকাতায় চর্চিত নব্য-ভারতীয় ধারা থেকে আলাদা। অথচ পাশ্চাত্য - নিরপেক্ষ প্রাচ্যচেতনাই যার চালকশক্তি। স্বতন্ত্র স্বদেশচেতনা ও ব্যক্তিগত নির্জনতার বোধ এই দুইয়ে মিলে গড়ে উঠেছিল বিনোদবিহারীর নিজস্ব শিল্পবোধ ও আঙ্গিক।

বিনোদবিহারী জন্মগ্রহণ করেন ১৯০৪ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতার নিকটবর্তী বেহালায়। তাঁর বাবা বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায়, মা অপর্ণা দেবী। ছয় ভাই ও দুই বোনের মধ্যে বিনোদবিহারী ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। একসময় তাঁদের পরিবারে স্বচ্ছলতা ছিল। জমিদারি উৎস থেকে তাঁর বাবার আয় ছিল। কিন্তু বিনোদবিহারীর জন্মের আগে থেকেই সেই সচ্ছলতার অবসান হয়েছে। বিপিনবিহারী চাকরি করতেন স্কট সিম্পসন কোম্পানিতে। সেখানে তিনি হেড-ক্লার্ক ছিলেন। বেশ বড় সংসার তাঁর একার আয়েই চল। একটা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ছিল বাড়িতে। ছিল স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি। তা থেকেই শৈশবের অসুস্থতা সত্ত্বেও বিনোদবিহারীর মনটা ধীরে ধীরে তৈরি হয়েছে।

আলোচ্য বইটিতে একটি ছবি আছে। একটি ফোটোগ্রাফ। তাতে বিনোদবিহারী ও তাঁর দুই দাদাকে একসঙ্গে দেখা যাচ্ছে। তিনটি কিশোর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। বিনোদবিহারী মাঝখানে। তাঁকে তখনও শিশুই বলা যায়। তিনজনেরই খালি গা। পরনে ধুতি। বিনোদবিহারীর একটি চোখ বন্ধ। তাতে যে দৃষ্টি নেই, তা বোঝা যাচ্ছে। তিন ভাইয়ের হাতেই ধরা হয়েছে তিনটি মোটা নোটা বই। ছবিটি তাঁর শৈশবের পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছু ইঙ্গিত বহন করে। হাতের বই যেমন একটা প্রতীক। পড়াশোনা ও জ্ঞানচর্চার একটা পারিবারিক পরিমণ্ডলের উপস্থিতি সূচিত করে। জ্ঞানচর্চাই বিনোদবিহারীর শৌল্পিক প্রজ্ঞাকেও পরিশীলিত করেছে।

শৈশবে বা কৈশোরে বিনোদবিহারীর ছবির দিকে উদ্বুদ্ধ হওয়ার প্রথম প্রেরণা তাঁর দাদা বিজনবিহারী, 'চিত্রকর' -এ লিখছেন 'এই অবস্থায় এক ঝলক আলো এসে পড়ল আমার অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ওপর। এই আলোর সন্ধান পেয়েছিলাম আমার দাদা বিজনবিহারীর সাহায্যে' (পৃ. ৯)। তাঁর দাদাই তাঁকে প্রথম ছবি দেখতে নিয়ে যান প্রদর্শনীতে। তিনি নিজে ছবির চর্চা করতেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল শিল্পী হওয়ার। আর্ট স্কুলে ভর্তি হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ছবি এঁকে জীবন নির্বাহ করা কঠিন বলে, সে পথে যাওয়া হয়নি তাঁর। তিনি হয়েছিলেন মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার। কিন্তু ছবি এঁকে গেছেন সারা জীবন। যদিও পরিচিত হয়নি, এই দাদাই বিনোদবিহারীর মধ্যে শিল্পী হওয়ার ইচ্ছার বীজ বপন করেছিলেন।

আর গ্রামীণ প্রকৃতির সান্নিধ্যে এসেছিলেন তাঁর এক দাদা বনবিহারীর সংস্পর্শে। বনবিহারী ডাক্তার ছিলেন। রেলের ডাক্তার হিসেবে কিছু দিনের জন্য বদলি হয়ে গিয়েছিলেন বিহারের গোদাবাড়িতে। স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য বিনোদবিহারী কিছুদিন ছিলেন গোদাবাড়িতে। সেখানে প্রকৃতির নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে নির্জনতাও দেখেছেন। লিখেছিলেন 'বালক বয়সের এই যে নির্জনতার অভিজ্ঞতা, বোধহয় কোথাও আমার ছবিতে প্রকাশ পেয়েছে'। (পৃ. ১৩) এর পরে বনবিহারী বদলি হয়েছিলেন পাবনা জেলার পাকশি শহরে। পদ্মার ধারেই পাকশি শহর। ওপারে রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহের কুঠিবাড়ি। পাকশিতে তাঁর সঙ্গী ছিলেন তাঁর উপরের ভাই বিমানবিহারী। বিমানবিহারীর সঙ্গে নানারকম অ্যাডভেঞ্চারে মেতেছিলেন এখানে। তার মধ্যে এই দৃশ্যের সুন্দর বর্ণনা আছে 'চিত্রকর' বইতে। এই অভিজ্ঞতাগুলিই শৈশবে তাঁর শিল্পীমনকে তৈরি করেছে। এই মন নিয়েই তিনি গেলেন শান্তিনিকেতনে।

তখন তাঁর বয়স বারো পেরিয়েছে। 'ঘরে বসে যথেচ্ছ বই পড়ি, ছবিও আঁকি। দেখি সকলেই স্কুলে যায় কেবল আমিই যাই না।'—লিখছেন 'চিত্রকর'-এ (পৃ. ২২)। তাঁর দাদার উদ্যোগে কালীমোহন ঘোষের সহায়তায় তাঁকে পাঠানো হল শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের আশ্রমবিদ্যালয়ে ১৯১৭ সালে। রবীন্দ্রনাথের সাথে দেখা করলেন। রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তাঁর কোনও বই পড়েছেন কিনা। পড়েছেন শুনে, তার চেয়েও বেশি মাইকেল মধুসূদনের 'মেঘনাদবদ কাব্য'-ও পড়া হয়েছে জেনে খুশি হয়ে ভর্তির অনুমতি দিলেন। ১৯১৯ সালে যখন কলাভবন খোলা হল, বিনোদবিহারী কলাভবনের একেবারে প্রথম পর্বের ছাত্র হিসেবে যোগ দিলেন। একই সঙ্গে কলাভবনে যোগ দিয়েছিলেন ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মন, অর্ধেন্দুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, হীরাচাঁদ দুগার, কৃষ্ণকিঙ্কর। কিছুদিন পরে যোগ দিয়েছিলেন রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বিনায়ক মাসোজি, বীরভদ্র চিত্রা রাও, মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। কলভবনের শুরুর পর্যায়ের ছাত্র ছিলেন এরা। রামকঙ্কির যোগ দিয়েছিলেন ১৯২৪ সালে। শান্তিনিকেতনে একেবারে শুরুতে প্রথমে অসিতকুমার হালদার, কিছু পরে নন্দলাল বসুর শিক্ষকতায় নব্য - ভারতীয় ধারার যে বিশেষ প্রবাহ, তারই প্রবক্তা ছিলেন এইসব শিল্পী। ভারতীয় রীতির সঙ্গে কিছু কিছু পাশ্চাত্য আঙ্গিক মিলিয়েছেন এঁদের কেউ কেউ। এই ধারার থেকে একেবারে স্বতন্ত্র দুটি পথ তৈরি করেছিলেন বিনোদবিহারী ও রামকিঙ্কর। দুজনের পথ ভিন্ন। স্বদেশচতনাকে বিশ্বচেতনার সঙ্গে মিলিয়েছেন দুজন দু-ভাবে। জেগে উঠেছে আধুনিকতার ভারতীয় আত্মপরিচয়ের দুটি স্বতন্ত্র পথ।

এখানে বাহুল্য হলেও এবং অনেকের জানা হলেও একটি প্রসঙ্গের উল্লেখ করা যেতে পারে, বিনোদবিহারীর শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠার পিছনে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকার গুরুত্ব বুঝতে। কলাভবনে যোগ দেওয়ার পরে নন্দলাল ততটা খুশি ছিলেন না বিনোদবিহারী সম্পর্কে। যাঁর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ সে কী করে ছবি আঁকবে এই ছিল তাঁর প্রশ্ন। তার পরেরটুকু আমরা বিনোদবিহারীর নিজের লেখা থেকেই শুনি:

> ''একদিন সকালে গুরুদেব কলাভবনে এসেছেন, নন্দবাবু তাঁকে আমার কথা এবং এবিষয়ে তাঁর আপত্তি জানালেন। গুরুদেব বললেন, 'নন্দলাল, ও কি করে নিজের কাজ করে?' 'আজ্ঞে হ্যাঁ, মনোযোগী ছাত্র। কিন্তু এই লাইনে...।' কথা থামিয়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'যদি ও নিয়মিত আসনে বসে এবং মনোযোগ দিয়ে কাজ করে তবে ওকে

স্থানচ্যুত কোনো না। ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা কোরো না। সকলকে নিজের নিজের পথ খুঁজে নিতে দাও।'

রবীন্দ্রনাথের এই একটি কথাই বিনোদবিহারীকে বিনোদবিহারী হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে। এরপরেও নন্দলাল অনেকদিন বিনোদবিহারীকে হাতে ধরে কিছু শেখাননি। সেটাও তাঁর পক্ষে আশীর্বাদ হয়েছে। নিজের পথ তিনি নিজে খুঁজে নিতে পেরেছেন। এরই কয়েক বছরের মধ্যে ১৯২১-এ বিনোদবিহারী আঁকলেন 'লাফটার' বা 'বীরভূম সামার ল্যান্ডস্কেপ' -এর মতো ছবি। নিজের পথে তাঁর যাত্রা শুরু হল।

।। চার।।

নিজের ছবির দিকে যেতে গিয়ে বিনোদবিহারী নিসর্গকে করে নিলেন তাঁর প্রধান বিষয়। আঙ্গিক হিসেবে তাঁর স্বভাবই যেন তাঁকে নিয়ে গেল ক্যালিগ্রাফির দিকে। এই ক্যালিগ্রাফির ভিতর দিয়েই তিনি প্রাচ্য তথা দূরপ্রাচ্যের আঙ্গিকের সঙ্গে একাত্মতা গড়ে তুললেন। বিষয় ও আঙ্গিক নির্বাচনের মধ্যদিয়েই তিনি তখনকার চিত্রচর্চার প্রচলিত ধারা থেকে স্বতন্ত্র এক পরিসর তৈরি করতে পারলেন। নন্দলালের অন্যান্য ছাত্ররা যাঁরা নব্য - ভারতীয় প্রচলিত রীতির প্রতি দায়বদ্ধ রইলেন পুরাণকল্প হয়ে উঠল তাঁদের প্রকাশের প্রধান বিষয় বা অবলম্বন। আঙ্গিকে তাঁরা গ্রহণ করছিলেন অজন্তা বা অন্যান্য ধ্রুপদি ঐতিহ্য থেকে যেমন, তেমনি মধ্যযুগীয় অনুচিত্রের ঐতিহ্য থেকেও। লৌকিকের ঐতিহ্য আসছিল ১৯৩০ -এর পর থেকে। যামিনী রায় ১৯২৮-২৯-এ লৌকিককে প্রধান অবলম্বন করে তুলতে পারলেন। ১৯৩৯-৩৭-এ নন্দলাল হরিপুরা পোস্টারের ছবি করেন। সেই প্রকল্পে বিনোদবিহারীরও ছিল সাহায্যকারীর ভূমিকা। নন্দলালের ছাত্র, বিনোদবিহারীর সতীর্থ অন্য অনেক শিল্পী ধ্রুপদি ভারতীয়তার সঙ্গে পাশ্চাত্য আধুনিকতার আঙ্গিকেরও কিছু কিছু সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছিলেন। রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বা মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত যেমন। বিনোদবিহারীর নির্বাচিত চিত্ররীতি এ সমস্ত থেকে আলাদা।

শান্তিনিকেতনে কলাভবনের প্রথম পর্যায়ের শিল্পীদের মধ্যে দুজন আধুনিকতাবাদকে বিশ্বগত মাত্রা দিতে চেষ্টা করেছিলেন। স্বদেশি ভাবধারার প্রতি দায়বদ্ধ থেকেই স্বদেশি সংকীর্ণতা থেকে ছবিকে মুক্ত করতে চাইছিলেন। দুজন সে পথে এগোচ্ছিলেন দু-ভাবে। রামকিঙ্কর আদিম - লৌকিকের উৎসকে সঞ্জীবিত করছিলেন। পাশ্চাত্য আধুনিকতার বা আধুনিকতাবাদের তিনটি আঙ্গিককে তার সঙ্গে সমীকৃত করেছিলেন—উত্তর প্রতিচ্ছায়াবাদ বা পোস্ট - ইম্প্রেশনিজম, অভিব্যক্তিবাদ বা এক্সপ্রেসনিজম এবং খনকবাদ বা কিউবিজম। এই সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর ছবি ও ভাস্কর্যের সামাজিক দায়বোধ ও কালচেতনার আলেখ্য তৈরি করেছিলেন। সেজন্য চল্লিশের সমাজবাস্তবতামূলক শিল্পধারার পূর্বসূরি হিসেবে রামকিঙ্করের অবদান অসামান্য। বিনোদবিহারী পরিক্রমা করছিলেন একেবারে ভিন্ন পথে। তাঁর আত্মমগ্নতা ও নির্জনতাবোধের কথা আমরা বলেছি। শৈশব থেকে দেশাত্মবোধের পরিমণ্ডলে তিনি বড় হয়েছেন। নন্দলালের স্বাদেশিকতার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল। রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববোধও তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে। এই দুইয়ের সমন্বয়কে তিনি এমন এক দিকে প্রবাহিত করলেন যেখানে ছবি হবে পরিপূর্ণভাবে প্রাচ্যচেতনায় স্পন্দমান। তাতে পাশ্চত্যের অনুষঙ্গ যদি কিছু থাকেও তা বৈশ্বিক উত্তরাধিকারের অঙ্গ হিসেবেই থাকবে। নিছক পাশ্চাত্যের অনুকরণ হবে না। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় ১৯৩০ -এর দশকে মাঝামাঝি সময়ে আঁকা 'ম্যান ইউথ ল্যানটার্ন' শিরোনামে একটি আত্মপ্রকৃতির কথা। টেম্পোরায় আঁকা এই ছবিটিতে অভিব্যক্তিবাদী রীতির অনুষঙ্গ আছে। কিন্তু নির্জনতার পরিমণ্ডল, ব্যক্তিগত দর্শনচেতনায় সমৃদ্ধ। একই কথা বলা যায়, 'ট্রি লাভার', 'ব্রিজ' বা ১৯৩৭ -৩৮এর 'স্ক্রোল শপ' ইত্যাদি ছবি সম্পর্কেও।

কে. জি. সুব্রামনিয়ন আলোচ্য গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত তাঁর প্রবন্ধে রামকিঙ্কর ও বিনোদবিহারীকে দুই ভিন্ন মেরুর শিল্পী বলেছেন (পৃ. ৪), বলেছেন, রামকিঙ্করের সাযুজ্য যদি কল্পনা করা যায় বাউলের সঙ্গে, তাহলে বিনোদবিহারীর মধ্যে দেখা যায় তাওবাদী সন্ন্যাসীর আদর্শ। পার্থিবতার সাক্ষাৎ সংস্পর্শ বা সংঘাত থেকে নিজেকে যেন তুলে নিতে চাইছেন বা মুক্ত করতে চাইছেন বিনোদবিহারী। তৈরি করতে চাইছেন আদর্শায়িত সৌন্দর্যের এক শাশ্বত পরিমণ্ডল। বৈশ্বিক সচেতনতা নিয়ে প্রাচ্যদর্শন সেখানে তাঁর প্রধান এক অবলম্বন হয়ে উঠছে। এজন্য তাঁর আঙ্গিকের প্রধান এক নির্ভর করে তুলছেন তিনি ক্যালিগ্রাফিকে। ক্যালিগ্রাফির অর্থ লিখনরীতি। হস্তাক্ষরের বিশেষ আদল। দূরপ্রাচ্য অর্থাৎ চিন ও জাপানের চিত্রকলায় এই আঙ্গিকের প্রচলন বিশেষ এক দৃশ্য - দর্শনের অনুভব জাগায়। প্রকৃতির মধ্যে বা বিশ্বের নানা গতিভঙ্গিত রয়েছে বিচিত্র ছন্দের বিন্যাস। সেই ছন্দের অনুভবই শিল্পের প্রাণ। বিনোদবিহারী এই সুস্মিত ছন্দকে নানাভাবে ব্যবহার করেছেন তাঁর ছবিতে। এই ছন্দই নৈঃশব্দ্যের মধ্যে বা ধ্যানমগ্নতার মধ্যে এক আনন্দের বোধ আনে তাঁর ছবিতে। আনন্দের এই উন্মীলনের মধ্যে দিয়েই তিনি বাস্তবতার প্রাত্যহিকের কলুষ থেকে মুক্ত করে তাঁর ছবিতে নিসর্গকে এক অনৈসর্গিক বোধে সঞ্জীবিত করেন।

কে. জি. সুব্রামনিয়ন তাঁর পূর্বোক্ত প্রবন্ধে এই ক্যালিগ্রাফি সম্পর্কে নিবিষ্ট আলোচনা করেছেন। বলেছেন একটি ক্যালিগ্রাফিক পেইন্টিং -এর আঙ্গিকগতভাবে থাকে দুটি মাত্রা: একটি 'স্ট্রাকচারাল' বা গাঠনিক, অন্যটি 'প্রোডিকেটিভ', বিধায়ক বা বর্ণনাত্মক। ক্যালিগ্রাফিক ছবিকে এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে হয়। গাঠনিকতার উপরে যদি জোর পড়ে বেশি তাহলে ছবি হয়ে যায় অলংকরণ ভারাক্রান্ত। আবার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যের উপর জোর পড়লে, ছবি হয়ে ওঠে অতিরিক্ত বর্ণনাত্মক। তাই কিছুটা তরল। এই দুই বৈশিষ্ট্যের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা নিয়েই বিনোদবিহারী পরীক্ষা - নিরীক্ষা করে গেছেন নিরন্তর। ছন্দের এই বিন্যাসের মধ্য দিয়েই তাঁর ছবিতে পরিস্ফুট হয়েছে বিভিন্ন অভিব্যক্তি। এই অভিব্যক্তির রূপান্তরও ঘটেছে। কখনও তাতে এসেছে সুললিত লাবণ্য। মূলত লিরিক্যাল। কখনও গাম্ভীর্য। সংক্ষুব্ধ চেতনার অভিব্যক্তি ঘটেছে সেখানে। প্রকৃতি থেকে বের করে আনা অনুপম লাবণ্যের দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায় 'লোটাস পন্ড' (১৯৪১), 'দোলন চাঁপা' (১৯৪৩), 'হলি হক' (১৯৫২), 'অমলতাস' (১৯৪৫), 'চালতা' (১৯৪৫), 'খোয়াই (স্কোল)' (১৯৩০-এর দশকের মধ্যভাগ) ইত্যাদি অজস্র ছবি। আবার অভিব্যক্তিবাদী গাম্ভীর্যের প্রকাশ হিসেবে উল্লেখ করা যায় 'সেল্ফ পোর্ট্রেট' (১৯৪১), 'সিটেড ফিগার (সেল্ফ পোর্ট্রেট)' (৩০/১/১৯৪১),

'ডোলি' (২৪/১/১৯৪৪), 'শরবন' (১৫/৫/১৯৩৮), নেপালে অবস্থান কালে করা 'সেরিমোনিয়াল প্রসেশন' (১৯৫৩) ইত্যাদি ছবি। আবার ১৯৫৭ সালের এপ্রিলে দিল্লিতে চোখে অস্ত্রোপচারের পরে যখন সম্পূর্ণভাবে তিনি দৃষ্টিশক্তি হারান তার পরে যে ছবি করেছেন তিনি, তাতে ছন্দের খেলা আবার অন্যরকম। অনেক স্পর্শময়।

কলাভবনের শিল্পশিক্ষা শেষ করার পর ১৯২৫ সালে বিনোদবিহারী বিশ্বভারতীতেই চাকরিতে যোগ দেন। প্রথম স্কুলে শিক্ষক হিসেবে। তারপর কলাভবনের গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালার অধিকর্তা হিসেবে। ১৯২৯ সালে তিনি কলাভবনের শিল্পশিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৯২৫ সালে রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে স্টেলা ক্রামরিশ শান্তিনিকেতনে আসেন। পাশ্চাত্য শিল্পের ইতিহাস বিষয়ে তিনি কলাভবনে বক্তৃতা দেন। এই ভাষণমালায় গথিক থেকে ডাডাবাদ পর্যন্ত তিনি অনুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করেন। রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ ছিল শিক্ষক - ছাত্র নির্বিশেষে প্রত্যেককে এই বক্তৃতায় উপস্থিত থাকতে হবে। তিনি নিজে ক্রামরিশের বক্তৃতায় বাংলা অনুবাদ করে দেন ছাত্রদের জন্য। বিনোদবিহারীর জীবনে এই বক্তৃতা শোনার ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। পাশ্চাত্য শিল্পের বিবর্তন সম্পর্কে যে জ্ঞান তিনি আহরণ করেন এখানে তাতে আরও পরিপূর্ণ করেন কলাভবন গ্রন্থাকারে নিরন্তর অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে। এই জ্ঞানই তাঁকে বিশিষ্ট শিল্প - তাত্ত্বিক ও শিল্প - ঐতিহাসিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেয়। পরবর্তী জীবনে তিনি শিল্পইতিহাসের অধ্যাপনা করেন কলাভবনে। তাঁর সমসাময়িক শিল্পীদের মধ্যে সকলের না হলেও দু-একজনের শিল্পতত্ত্বে পাণ্ডিত্য ছিল, মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত যেমন। কিন্তু বিনোদবিহারীর মতো কেউই জ্ঞানের আলো দিয়ে শিল্পসৃজনকে পরিশীলিত ও স্বাতন্ত্র্যে ভাস্কর করতে পারেন নি। এ বিষয়ে তাঁর তুলনা চলে পূর্বসূরিদের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের কথা স্বতন্ত্র। ১৯২২ সালেই জার্মানির 'বার্ডহাউস' শিল্পগোষ্ঠীর মূল ছবির প্রদর্শনী এসেছিল কলকাতায়। বিনোদবিহারী সেই প্রদর্শনী দেখেছিলেন কিনা জানা নেই। পাশ্চাত্য শিল্পের যে ঢেউ এসে পৌঁছল এ দেশে তার কিছু অভিঘাত রবীন্দ্রনাথের ছবিতেও পরিস্ফুট হল। বিনোদবিহারী কিন্তু তাকে আত্মস্থ করেও অসামান্য প্রজ্ঞায় তাঁর শিল্পের ভিতর বিশ্বদীপ্ত এক জাতীয় চেতনা বা প্রাচ্যচেতনাকে উন্মীলিত করে গেছেন। জাতীয়তাকে সংকীর্ণ গণ্ডি থেকে মুক্ত ককে বৈশ্বিক মাত্রায় অভিষিক্ত করেছেন। নব্য - ভারতীয় ঘরানার সন্ধানকে যুগোপযোগী করে প্রসারিত করেছেন। আমাদের আধুনিকতার ইতিহাসে এটাই তার সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান।

জাপানের সঙ্গে ভারতের শিল্পবোধের আদানপ্রদান আধুনিক পর্বে বিংশ শতকের গোড়া থেকেই শুরু হয়েছিল। ১৯০২ সালে ওকাকুরা তেনশিন কলকাতায় আসেন। অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে তখন তাঁর পরিচয় ঘটে। শিল্পের ক্ষেত্রে এশিয়ার ঐক্যের বাণী তিনি প্রচার করেন। ভারতীয় শিল্পীদের তিনি উদ্বুদ্ধ করেন এ বিষয়ে। দ্বিতীয়বার তিনি আসেন ১৯১২ সালে। দ্বিতীয়বার ভ্রমণে ভারতীয় শিল্পের নান্দনিক মুক্তি তাঁকে খুশি করেছিল। ১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ জাপান যান। জাপানের শিল্পকলার উৎকর্ষ ও স্বাতন্ত্রও তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে। অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথকে তিনি বলেন ঘরের গণ্ডি ছেড়ে বাইরে বেরোতে। তাঁরই উদ্যোগে জাপানের প্রখ্যাত শিল্পী আরই কম্পু সে বছর এ দেশে আসেন। জোড়াসাঁকোর 'বিচিত্রা' -য় তিনি জাপানি প্রকরণ শেখান। নন্দলালও তাতে উপকৃত হন। ১৯২৪ -এ রবীন্দ্রনাথ যখন আবার জাপান ও চিনে যান, তখন নন্দলালও তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন।

জাপানের সঙ্গে আদান-প্রদানের এই প্রেক্ষাপটে বিনোদবিহারীও খুব উদ্বুদ্ধ ছিলেন। ১৯৩৬ সালে তিনি জাপান যান নিজের খরচে। সেখানে শিল্পকলার নিবিষ্ট দেখাশোনাতেই তিনি নিমগ্ন ছিলেন। সেখানকার প্রকৃতি বা জীবনের দিকে তেমন নজর দেওয়ার সময় পান নি। জাপানে তাঁর ছবির প্রদর্শনী হয় এপ্রিলের ২৬ থেকে ২৮। সেখানে অল্পসময়ের অবস্থানকালে জাপানি প্রকরণ তিনি নিবিষ্টভাবে আয়ত্ত করেন। তাঁর পরবর্তী চিত্রাধারাকে তা প্রভাবিত করে। 'চিত্রকর' রচনায় বলেছেন : '১৯৪০ সালে কলাভবনের ছাত্রাবাসের ছাদের নিচের কাজ যখন করেছি তখন আমার তুলির টানটোনের বা রঙের ছাপছোপ দেওয়ার রীতি অনেক বদলেছে'। (পৃ. ৪৩)

।। পাঁচ।।

১৯৪০-এ করা কলাভবন ছাত্রাবাসের এই ম্যুরালটিতে বিনোদবিহারী নিসর্গচিত্র সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব এক দর্শনকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন। 'বীরভূম ল্যান্ডস্কেপ' নামে এই নিসর্গদৃশ্য ছাদের তলদেশে আঁকা। নিচ থেকে মুখ তুলে উপরে তাকিয়ে দর্শককে তা দেখতে হয়। এর পার্সপেকটিভ বা পরিপ্রেক্ষিত বিন্যাসরীতি একেবারে অন্যরকম। যার কোনও তুলনা পাশ্চাত্য চিত্রকলায় নেই। মাঝখানে কেন্দ্রে একটি বর্গাকার পরিসর। তাকে ঘিরে চারপাশে গাছপালা, পশুপাখি, মানুষের জীবন আবর্তিত হতে থাকে। শিবকুমার তাঁর লেখায় বলেছেন, পাশ্চাত্য ভাবনার নিসর্গ আঁকা হয় বাইরের দর্শকের দৃষ্টিকোণ থেকে। শিল্পী বাইরে থেকে দেখছেন নিসর্গকে। তারপর নৈর্ব্যক্তিকভাবে যথাযথ রূপ দিচ্ছেন। এই নিসর্গে (বিনোদবিহারীর 'বীরভূম ল্যান্ডস্কেপ') শিল্পী রয়েছেন নিসর্গেরই ভিতরে। নিসর্গের সঙ্গে তাঁর একাত্মতাকে তিনি পরিস্ফুট করেছেন। সেই একাত্মতায় ফুটে উঠছে সমগ্রের রূপ। এ নিসর্গের বাস্তবতা নৈর্ব্যক্তিক নয়। তাই আপাত - স্বাভাবিকতা এতে নেই। কিন্তু রয়ে গেছে ছন্দের স্বতন্ত্র এক স্পন্দন। এই ছন্দোময়তাতেই এসে যাচ্ছে জীবনের বা অস্তিত্বের অন্য এক অভিজ্ঞান। গতানুগতিকের ভিতরই ছন্দের ভিতর দিয়ে আনন্দের এই অভিজ্ঞানের উন্মোচন এই ভিত্তিচিত্তে বিনোদবিহারীর বিশেষ অবদান।

১৯৪২ -এ তিনি চিনাভবনে করেন 'লাইফ অন ক্যাম্পাস' নামে আর একটি ম্যুরাল। এর বিন্যাস একেবারেই অন্যরকম। এখানে পরিসর - বিভাজন ও রচনাবিন্যাল জ্যামিতক। সরলরেখার সমকৌণিক তীক্ষ্ণ সংযোগে গড়ে উঠেছে আয়তক্ষেত্রাকার অজস্র পরিসর। তা পরস্পর সমান্তরালভাবে সন্নিবিষ্ট। স্থাপত্যের সেই আয়তাকার পরিসরের সঙ্গে মিল রেখে মানুষের অবয়গুলিকেও করা হয়েছে দীর্ঘায়ত। সেগুলিও সমান্তরালভাবে বিন্যস্ত। মধ্যবর্তী অংশে যেখানে গাছের উপস্থিতি আছে সেখানকার ছন্দিত অলংকরণের তাঁর নিজস্ব রীতির অলংকরণ পদ্ধতির সঙ্গে কিছু মিল পাওয়া যায়। দু-পাশের পরিসর বিন্যাসের ক্যালিগ্রাফির ধরণ একেবারে আলাদা। শান্তিনিকেতনেই ক্যাম্পাসের বিভিন্ন অংশের অধ্যয়ন ও জীবনের চলমানতাকে শিল্পী রূপ দিতে চেয়েছেন। জ্যামিতিকতার ভিত্তিতে এমন এক আঙ্গিক এখানে তিনি গড়ে তুলেছেন, যা তাঁর পর্ববর্তী চিত্রধারা

থেকে একেবারেই আলাদা। ছন্দের স্তন্ত্র বৈচিত্র্য এখানে।

শুধু ম্যুরাল রচনার ক্ষেত্রেই নয়, বিনোদবিহারী সারা জীনের কাজের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও উচ্চকাঙ্ক্ষাসম্পন্ন রচনা শান্তিনিকেতনে হিন্দিভবনের তিনটি দেয়ালজুড়ে করা 'দ্য লাইফ অভ মেডিয়াভেল সেইন্টস' বা 'মধ্যযুগের সন্তরা' শীর্ষক ম্যুরালটি। ১৯৪৬-৪৭ সালে প্রায় ছ'মাসের পরিশ্রমে দু-একজন ছাত্রের সহায়তায় এটি তিনি করেছেন। দরজার উপর থেকে ছাদ পর্যন্ত দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দিকের তিনটি দেয়াল জুড়ে এর বিস্তার। চিত্রধারাটি শুরু হয়েছে দক্ষিণের দেয়ালে বাঁ-দিকে হিমালয়ের শীতল নির্জনতায় সাদুদের ধ্যান, আরাধনা ও সংগীতচর্চার মধ্য দিয়ে। প্রাচীন ভারতের অধ্যাত্মসাধনার পরিমণ্ডল দিয়ে শুরু। পরের দৃশ্যেই শিল্পী নিয়ে আসেন রামানুজকে। শীর্ণ অবয়বের সুউচ্চ দীর্ঘদেহী রামানুজ দাঁড়িয়ে থাকেন প্রশান্ত ভঙ্গিতে। পরের দৃশ্যে আসে কারুকর্মীদের জগৎ। সেখানে মধ্যমণি হয়ে বসে আছেন কবীর, ধ্যানমগ্ন, তার সামনে সংগীতের পরিমণ্ডল। এরপর দৃশ্য প্রবাহিত হয় বেনারসের ভিতর দিয়ে। বেনারসের গঙ্গায় নৌকা, তীরে অর্চনা নিয়ে নারীদের দাঁড়িয়ে থাক, কুটিরের জ্যামিতিক বিন্যাসের ভিতর সাধারণ নর-নারীর ধর্মচর্চা। এর পরের দৃশ্যেই দাঁড়িয়ে থাকেন সুরদাস। তাঁর ডান হাতের মুদ্রায় প্রতীকায়িত থাকে ঐশীশক্তির প্রতি বিস্ময়। তৃতীয় দেয়ালে রামানুজের বিপরীতে দেখা যায় অশ্বারূঢ় গুরু গোবিন্দ সিংহ। বাঁ-হাতে ঘোড়ার লাগাম ধরা। ডান হাতে কোষমুক্ত তরবারি। এই দৃশ্য পেরিয়ে উত্তরের দেয়ালে গ্রামীণ কৃষিজীবী মানুষের জীবনের বর্ণনা। মধ্যযুগ পর্যন্ত ভারতীয় সভ্যতার জয়যাত্রাকে দেখিয়েছেন হিমালয়ে ঋষিদের অধ্যাত্মসাধনা থেকে সমতলে কৃষিভিত্তিক জীবনের বিস্তার পর্যন্ত। এরই ভিতর রামানুজ, কবীর, সুরদাস, গুরু গোবিন্দ সিংহ ইত্যাদি নানা মানবিক সাধনার বিস্তার, যা পার্থিব জীবনকে অপার্থিবতার দিকে নিয়ে যায়।

এই ভিত্তিচিত্র রচনায় শিল্পী যে আঙ্গিক ব্যবহার করেছেন তাতেও লৌকিক ও মধ্যযুগীয় বাইজান্টাইন ইত্যাদি দেশি-বিদেশি নানা চিত্ররীতির সমন্বয়। ১৯৭২ সালে ৫ মার্চ সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন,

> 'বেসিক জিনিসটা নিয়েছি। যে বেসিক জিনিসটা আমার কাছে Pre-Renaissance বলে মনে হয়েছে। জিওত্তোকে তো আমি সে রকমভাবে Renaissance ধরি না, তাকে আমি Gothic ধরি। আর তারপর Byzentine,জৈন, পটপাটা, এসব historian-এর কাছে অনেক তফাৎ থাকতে পারে, কিন্তু আমার কাছে তোমার কাছে—আর্টিস্টের কাছে কি তফাৎ? একটা জৈনের পাশে একটা folk figure দিলে কার বাবার সাধ্যি ধরে জিজ্ঞেস করি? একটা কাঠের পুতুলেতে যদি তুমি একটা Byzentine চোখ আঁক, কার বাবার সাধ্যি আছে ধরে?'

এখানে বিনোদবিহারী আঙ্গিক নিয়ে, আঙ্গিকে বিভিন্ন উৎসের সমন্বয় বা eclecticism নিয়ে যে উক্তি করেছেন 'মধ্যযুগের সন্ত' প্রসঙ্গে তা বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। তাঁর পরবর্তী পর্যায়, নেপাল পর্বেও, তাঁর কালিগ্রাফিক ফর্মের সঙ্গে মধ্যযুগীয় অভিব্যকক্তিবাদী স্তব্ধতার নানা অনুষঙ্গ মিশেছে।

বিনোদবিহারীর ছবির ধারাবাহিকতায় 'মধ্যযুগের সন্ত' সমাজতাত্ত্বিক দিক থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থল অধিকার করে আছে। শিল্পের সামাজিক দায় সম্পর্কে শিল্পীর একটি নিজস্ব বক্তব্য আছে। 'চিত্রকর' গ্রন্থে তিনি বলেছেন,

> 'আসল কথা, আমার স্বভাব এমন যে কোনো সামাজিক দায়িত্বের সঙ্গে আমি নিজেকে মিলিয়ে নিতে পারিনি। পাকিস্তান - হিন্দুস্থানের ইতিহাস তৈরি হয়েছে আমার চোখের সামনে। দুর্ভিক্ষ, বন্যা, ভূমিকম্প ঘটেছে/এই সঙ্গে কোনো ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আমার ছিল না। এ বিষয়ে কোনো ছবিও আমি করি নি।' (পৃ. ৩৭)

এই পরিপ্রেক্ষিতেই মধ্যযুগের সমস্ত ছবিটি গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৪৬-৪৭ সালে যখন দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িক সংঘাতে সারা দেশ বিপন্ন, মানবতার সমস্ত মূল্যবোন যখন ভেঙে যাচ্ছে, তখন বিনোদবিহারী এই ম্যুরালটি করেছেন। তখন তিনি দেখাচ্ছেন, ভারতবর্ষের সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সাধনা এক সময় কোন স্তরে বাঁধা ছিল। এই মূল্যবোধকে তুলে ধরেই । হিন্দি ভবনের ম্যুরাল শেষ করার পর বিনোদবিহারী শান্তিনিকেতন ত্যাগ করেন। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর থেকে শান্তিনিকেতনে যে রক্ষণশীলতার আবহাওয়া বেড়ে উঠতে থাকে তাকে মেনে নিতে পারেননি তিনি। তাঁর নিজের কথায়, 'রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর থেকে সারা বিশ্বভারতী জুড়ে একরকমের রক্ষণশীলতা দেখা দেয়। নন্দলাল সম্পূর্ণ স্বাধীন থেকেও কলাভবনকে রক্ষণশীলতার দিকে এগিয়ে নিয়ে চললেন রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর থেকে।' ('চিত্রকর', পৃ. ৪৬) নন্দলাল এমনকি তাঁকে হিন্দিভবনের ম্যুরাল করা সম্পর্কেও আপত্তি করেছিলেন। এরকম পরিস্থিতিতে শান্তিনিকেতন ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত। ১৯৪৮ -এর অক্টোবরে তিনি নেপাল যান কাঠমাণ্ডুতে নেপাল সরকারের সংগ্রহশালার কিউরেটরের চাকরি নিয়ে। এর আগে ১৯৪৪ -এ তিনি কলাভবনেই ছাত্রী মনসুখানিকে বিয়ে করেন ১৯৪৮ -এর জানুয়ারিতে। ১৯৪৮ -এর জানুয়ারিতে তিনি বম্বে, বরোদা, আমেদাবাদ ও জয়পুর ভ্রমণ করেন।

১৯৫০ -এর অক্টোবর (সম্ভবত) পর্যন্ত তিনি নেপালে ছিলেন। নেপাল পর্বে তিনি যে সমস্ত ছবি করেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'নেপাল' শিরোনামে একটি জলরং ১৯৪৯ -এর কাজ, 'টেম্পল সিন', রেশমি কাপড়ের উপর জলরং ৪.১২.১৯৪৯-এ আঁকা, 'নেপাল টেম্পল উইথ মাউন্টেন বিহাইন্ড') জলরং ও কালি - কলম ১৯৪৯, 'নেপাল (টেম্পল উইথ ওয়রশিপার্স)' জলরং ১৯৪৯, ইত্যাদি ছাড়াও অজস্র স্কেচ। এসব ছবিতে হিমালয় আসছে প্রেক্ষাপট হিসেবে। ক্যালিগ্রাফির বৈশিষ্ট্য আরও পরিশীলিত হচ্ছে। এসব ছবিতে হিমালয় আসছে প্রেক্ষাপট হিসেবে। ক্যালিগ্রাফির বৈশিষ্ট্য আরও পরিশীলিত হচ্ছে। পরিমিতিবোধ প্রধান্য পাচ্ছে। বৌদ্ধধর্মের অনুষঙ্গের অধ্যাত্মচেতনা এমনকি নিসর্গমূলক ছবিতেও পবিত্র এক আলো-ছায়ার মতো পরিব্যাপ্ত হচ্ছে। ১৯৫২ -তে মুসৌরি - তে করা 'টেম্বল বেল' (টেম্পারা) ছবিটি এসব বৈশিষ্ট্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। দুই মানবী পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কোনও মন্দিরের অভ্যন্তরে। একজন দীর্ঘ অপরজন অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব। দীর্ঘায়ত নারী মন্দিরের ঘন্টা বাজাচ্ছে। এই হল ছবিটির বিষয়। দুই মানবীর উপস্থাপনা ছন্দোময় রেখার চলনে গড়ে ওঠা তাঁদের অবয়বের আয়তনময়তা, রেখাধৃত দেহঘেরের মধ্যে বর্ণের ছায়াতপের সংবৃত প্রলেপ—এসবের মধ্য দিয়ে এমন এক আধ্যাত্মিকতা - অন্বিত লাবণ্য এসেছে এই ছবিতে, ধ্রুপদি ও লৌকিকের এমন এক সমন্বয় ঘটেছে, পাশ্চাত্য প্রতিফলিত প্রাচ্য - আঙ্গিক এত সমৃদ্ধভাবে আবার ফিরে আসছে আমাধের

আধুনিকচেতনার ১৯৩০ ও ৪০ -এর দশকের শিল্পীদের প্রকাশে যার তুলনা বিরল।

নেপালের অভিজ্ঞাতাকে তিনি আরও পরিশীলিত রূপ দেন ১৯৫০ -এ রাজস্থানের বনস্থলী বিদ্যাপীঠে এগ - টেম্পারায় করা 'নেপাল ফেস্টিভাল প্রসেশন' শীর্ষক ভিত্তিচিত্রে। দুটি প্যানেলে বিভক্ত এই ম্যুরাল। অবয়বগুলি দীর্ঘায়ত। এই দীর্ঘায়ত উপস্থাপনার কিছুটা যে অপাথিবতার দ্যোতনা আসে, চিত্রক্ষেত্র আয়তাকার তীক্ষ্ণ জ্যামিতিক ক্ষেত্রে বিভাজিত। একটি উৎসবের মিছিল যাচ্ছে পথ দিয়ে। উপরে গৃহবাসিনীরা জানলা দিয়ে দেখছে সেই মিছিল। অনেকটা শূন্য পরিসর ছাড়া আছে অবয়ববিন্যাসের মাঝখানে। এই অবকাশ বিশেষ এক নান্দনিক মাত্রা এনেছে যার সঙ্গে তুলনা করলে হিন্দি ভবনের 'মধ্যযুগের সন্ত' রচনাকেও একটু যেন অবকাশহীন ভিড়াক্রান্ত মনে হয়। ১৯৫০ -এর মধ্যে বিনোদবিহারী তংার জীবনের শেষ্ঠ কাজগুলি করে ফেলেছেন। সেই সময়ের সকল দ্বন্দ্ব-বিরোধকে অতিক্রম করে চিরন্তন ভারতীয় অধ্যাত্মচেতনাকে আধুনিকতায় অভিষিক্ত করেছেন।

নেপালের পরে ১৯৫১-র অক্টোপরে তিনি গেলেন মুসৌরিতে। ১৯৫২-তে সেখানে 'আর্ট' অ্যান্ড ক্রাফ্ট সেন্টার' প্রতিষ্ঠা করলেন। ১৯৫৪ -র গ্রীষ্মে পাটনা গেলেন। পাটনা আর্ট স্কুলকে পুনর্গঠনের জন্য আমন্ত্রণ করা হয়েছিল তাঁকে। তিনি সেই দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ওখানকার সমস্কারাচ্ছন্ন পশ্চাৎপদ পরিবেশে তাঁর পক্ষে ঐ স্কুলের শিক্ষারীতির কোনও পরিবর্তনই সম্ভব হয়নি।

পাটনাতেই একদিন হোঁচট খেয়ে পড়ে যান। বোঝা যায় তাঁর চোখের দৃষ্টিশক্তি আরও সমস্যাসংকুল হয়েছে। দিল্লিতে যান চক্ষু পরীক্ষা করাতে। ওখানে চিকিৎসক চোখে অস্ত্রোপচারের কথা বলেন। তিনি জানান, পূর্ববর্তী চিকিৎসকরা বলেছিলেন, এ চোখে অস্ত্রোপচার করা বিপড্ডনক। ডাক্তার জানিয়েছিলেন, তাঁর তো হারানোর কিছুই নেই। চোখে অস্ত্রোপচার হল ১৯৫৬ সালে। সফল হল না অস্ত্রোপচার। তারপর তাঁর কথাতেই শুনি:

> 'হাসপাতালে কয়দিন কাটিয়ে একদিন অপরাহ্নে কালো চশমা চোখে লীলার হাত ধরে বেরিয়ে এলাম নার্সিংহোমের বাইরে। বাইরে রৌদ্রের উত্তাপ বুঝছি, কিন্তু আলো দেখতে পাচ্ছি না। তারপর প্রায় বিশ বছর হতে চলল, আলো আর আমি দেখিনি। শাদা কাগজের ওপর নানা রঙের ছোপছাপ দিয়ে ছবিও আর আমি করি নি।
> আজ আমি আলোর জগতে অন্ধকারে প্রতিনিধি।' ('চিত্রকর', পৃ. ৭৩)

।। ছয়।।

সম্ভবত সমগ্র বিশ্বের শিল্পের ইতিহাসেই বিনোদবিহীর বৈশিষ্ট্য এই যে দৃষ্টিহীনতা তাঁর সৃজনশীলতাকে রুদ্ধ করতে পারে নি। শুধু তাঁর প্রকাশভঙ্গিকে পাল্টেছে। তাঁকে দিয়েছে অন্তর্দৃষ্টি। যা দিয়ে দৃশ্যের গভীরে অন্য এক আলো সন্ধান পেয়েছেন। ১৯৫৭ -তে তিনি দেরাদুন ও তারার বনস্থলীতে যান। ১৯৫৮-তে শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন কলাভবনে শিল্প ইতিহাসের অধ্যাপক হিসেবে। এই সময় থেকে ছবি ও ভাস্কর্য ছাড়া লেখাতেও তাঁর প্রতিভা বিকশিত হতে থাকে।

তাঁর দৃষ্টিহীনতার পর্যায়ের অভিজ্ঞতা তিনি লিখে গেছেন, তাঁর আত্মজীবনীর দ্বিতীয় অংশ 'কত্তামশাই'-তে। 'কত্তামশাই' এক অসামান্য আলেখ্য। তাঁর ছবিতে তিনি যা করেন নি, এই বইয়ের লেখায় তিনি অভিজ্ঞতার সেই পরিসরে সঞ্চরণ করেছেন। কল্পরূপ বা ফ্যানটাসির প্রকাশ তাঁর ছবিতে কম। এখানে সেই ফ্যান্টাসি অনেক জায়গাতেই সুরলিয়ালিজমে পর্যায়ে চলে গেছে।

এই কল্পরূপের দৃষ্টান্ত একটু দেখে নেওয়া যায়। চেতনের উপর অবচেতনের খেলার একটি খণ্ডচিত্র এঁকেছেন, সেটি এইরকম:

> 'তিনি (কত্তামশাই) এসে দাঁড়িয়েছেন আয়নার সামনে নিজেকে দেখবেন বলে। কারুকার্যখচিত ফ্রেমে আঁটা সুন্দর বিরাট আয়না—কিন্তু সেখানে কোনো প্রতিবিম্ব নেই।
> এইবার কত্তামশাই দেখলেন আয়নার উপর কিসের যেন ছায়া— তাঁর নিজের নয়। কিন্তু একি! এ যেন এক নগ্ন নারীমূর্তি! তিনি পেছতে পারছেন না, মুখ ফিরিয়ে নেবার শক্তিও নেই। অপলক চোখে চেয়ে আছেন সেই নগ্ন নারীমূর্তির দিকে।... কত্তামশাই উত্তেজিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন : এ কে! লাস্যময়ী হাস্যময়ী নগ্ন নারীমূর্তির ঠোঁটে অপরূপ হাসি।

—এতদিন ধরে যারা কথা বলে বসে ভাবছিল, আমি সেই।' (পৃ. ৮৭-৮৮) এই সময় তিনি রঙিন কাগজ কেটে আর সেঁটে ছবি করছেন। ছবির 'ফর্ম'-টাই হয়ে গেল একেবারে অন্যরকম। রঙের 'টোনাল ভ্যারিয়েশন' কিছু রইল না। এক - একটা 'ফর্ম' বা রূপবন্ধ এক একটা নির্দিষ্ট রঙের কাগজ কেটে করা। সেটা সাঁটা রয়েছে বিপরীত রঙের প্রেক্ষাপটের পরিসরের উপরে। একটা মানুষ তৈরি করতে গিয়ে তার শরীর এক রঙের, হাত, পা, মাথা অন্য রঙের। সেই বর্ণক্ষেত্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক আঁতাত তৈরি হচ্ছে। যে অবয়বটা গড়ে উঠছে, তার আবার টেনশন গড়ে উঠছে অন্য অবয়বের সঙ্গে এবং চিত্রক্ষেত্রের প্রেক্ষাপটের সঙ্গে। এই টেনশনই কোলাজধর্মী এই ছবিগুলির প্রাণ। কোথাও বা রঙিন কাগজের ফর্মের সঙ্গে বর্ণহীন খবরের কাগজ সেঁটেছেন টুকরো টুকরো করে। খবরের কাগজের অক্ষরপুঞ্জ দৃশ্যতার একটা বিশেষ মাত্রা তৈরি করেছে। রঙিন পরিসরের সঙ্গে ও তার একটা টেনশন তৈরি হচ্ছে। কোলাজধর্মী এই ছবির অনেকগুলিতে যেমন আখ্যানের বিন্যাস ঘটেছে। অনেকগুলি আবার পরিপূর্ণ জ্যামিতিক বিমূর্ততার দিকেও গেছে।

ন্যাশনাল গ্যালারির প্রদর্শনীতে এরকম ছবি অনেকগুলি ছিল। তার কয়েকটির উল্লেখ করা যায়। ১৯৫৭ -তে করা 'স্টিল - লাইফ ইউথ স্পেকটাকল্‌স' অনেকটাই বিমূর্ত রচনা। নীল চশমাটি পড়ে আছে খয়েরি আয়তাকার পরিসরের কাগজের উপর। 'লেডি ইউথ ফ্রুট' ২১.৬.৫৭ তারিখের রচনা। ছেঁড়া কাগজের বোল্ড স্ট্রোকের বর্ণিল পরিসরের মতো ব্যবহার করেছেন। ১৯৫৮-র 'বস্ত্রহরণ' কৃষ্ণ ও গোপিনীদের পুরাণকল্পের বিষয় নিয়ে করা। ১৯৬২-র 'ক্যাট ইউথ রেড ফেস' বিড়ালের অছিলায় বিশুদ্ধ ফর্ম হিসেবে অসামান্য। কৃষ্ণাভ ধূসর প্রেক্ষাপট। চিত্রক্ষেত্রের অনেকটা দৈর্ঘ্য জুড়ে সবুজে গড়া বিড়ালের শরীর। সামনের

একটি পা উপর দিকে তোলা। তাতে শরীরে জঙ্গমতা এসেছে। গলার উপর লাল রঙে মাথাটি স্থাপিত। চোখদুটি গোলাকার হলুদ কাগজ। নাকটি সাদা ট্রাপিজ আকৃতির। নিচে লাল কাগজ ছিঁড়ে লেখা 'হাল - খাতা'। কয়েকটি সংখ্যা, কয়েকটি শব্দ ইতস্তত ছড়ানো। মুখের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে লেজ ও পিছনের একটি পা-ও লাল রঙের। ২.৮.৬২র 'ফিশারম্যান' -ও তেমনি একটি কৌতুকদীপ্ত রচনা। নীল কাগজ সেঁটে করা জেলে। দু-হাত দু-দিকে ছড়ানো। ডান হাতে ঝোলানো রয়েছে একটি ছোট মাছ। একটি লালচে বাদামি রঙের কুকুর দাঁড়িয়ে উঠে ওই মাছটি ধরার চেষ্টা করছে। ফর্ম - নিয়ে এরকম খেলার অজস্র দৃষ্টান্ত রয়েছে। দৃষ্টিহীনতা তাঁর ফর্ম - চেতনাকে যে কোনবাবেই প্রতিহত করতে পারেনি, এই রচনাগুলি তারই দৃষ্টান্ত।

ক্যালিগ্রাফিরও একটা স্বতন্ত্র ধরন তৈরি হয়েছে এই সময়। মোটা কলমে রেখা টেনে এর রঙে ড্রয়িং করেছেন। ১৯৬২-র 'স্টিল-লাইফ উইথ -রে অসামান্য দৃষ্টান্ত। এ ধরনের কাজ সম্পর্কেও সমস্যা অনুভব করেছেন এক সময়। ১৯৭১ সালে সত্যজিৎ রায়ের নেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন সে কথা। সত্যজিৎ জিজ্ঞাসা করেছেন—'আপনি তো স্কেচ করেন এখনো।' উত্তরে বলেছেন বিনোদবিহারী :

'আজকাল আর বিশেষ করি না। প্রথম দিকে করেছি। পৃথ্বীশ Flowmaster কলম এনে দিয়েছিল কয়েকটা। কিন্তু অসুবিধেও আছে। কখন কালি ফুরিয়ে যায় টের তো পাই না। ...রঙের ব্যাপারেও ইন্টারেস্ট চলে যাবে। আগে রঙীন কাগজের টুকরো কেটে Collage করতুম, কিন্তু এখন ক্রমে বুঝতে পারছি রঙে Exact shade মুখে বলে বোঝানো যায় না। ...এখনো যে ইন্টারেস্টটা রয়ে গেছে সেটা হল ফর্ম সম্পর্কে। আর টেনশন। সে মিউর‍্যালটা করছি তাতেও ওই পাশাপাশি মানুষের figure গুলোর মধ্যে পারস্পরিক টেনশন, সমগ্র কম্পোজিশনের টেনশন। এটাই হল বড় কথা।' ('বিষয় চলচ্চিত্র' : সত্যজিৎ রায়। আনন্দ। পৃ. ১২২-১২৩)।

কলাভবনের পেইন্টিং - স্টুডিও-র উত্তরের দেয়ালে করা সিরামিক টাইল এর এই ম্যুরালটি তিনি শেষ করেছিলেন। ১৯৭২ সালে। সহজ, স্বচ্ছন্দ, সাধারণ মানুষের যাতায়াত নিয়ে গড়ে উঠেছে এই ম্যুরাল। তাঁর অন্যান্য মুরাল। তাঁর অন্যান্য মুরাল -এর তুলনায় অনেক সারল্যময়। সারল্যের ভিতর রয়েছে অন্তর্দৃষ্টির পরিচয়। সত্যজিৎ রায় তাঁকে নিয়ে 'ইনার আই' তথ্যচিত্র করেছেন ১৯৭১ সলে। এই তথ্যচিত্রের এই ম্যুরালটি করার প্রক্রিয়া আমরা কিছু কিছু দেখছি। এই দৃষ্টিহীনতার পর্যায়ে তিনি করেছেন কিছু ভাস্কর্যও। ফর্ম সম্পর্কে তাঁর অন্য এক অনুভূতি এসেছে তখন। নরম মোম হাতে আঙুলে চেপে চেপে তৈরি করেছেন মূর্তি। ১৯৫৮ -তে করা এরকম কয়েকটি ভাস্কর্য ছিল ন্যাশনাল গ্যালারির প্রদর্শনীতে। 'শেফার্ড', 'সাধু', বাফেলা'—এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত। এই ভাস্কর্য নিয়েই 'কত্তামশাই' বইতে সৃজন সম্পর্কে পরম উপলব্ধির কথা জানিয়েছেন। সেইটুকু আমরা শুনতে নিতে পারি।

।। সাত।।

বিনোদবিহারী তাঁর সারা জীবনের কাজের মধ্য দিয়ে নব্য - ভারতীয় ধারার পরবর্তী আধুনিকতার উত্তরণের অন্যতম একটি পথ নির্দেশ করে গেছেন। তিনি যখন শান্তিনিকেতনে এলেন তখন নন্দলালের নেতৃত্ব যেখানে যে চিত্রকলার বিকাশ হচ্ছে, তাতে জাতীয়তাবাদী আবহমণ্ডলের প্রভাব ছিল। এই জাতীয়তাবাদী শিল্পকে বিনোদবিহারী কখনো মন থেকে গ্রহণ করতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথও চাইছিলেন, তথাকথিত জাতীয়তাবদের বাইরে শিল্পের এক উত্তরণ। বিনোদবিহারীকে তিনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন। বিনোদবিহারী বলেছেন সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে:

> 'তিনি (রবীন্দ্রনাথ) আমার লিখেছিলেন, সে চিঠি আছে, যে তুমি যদি নন্দলালকে ছেড়ে না দাও, তাহলে তুমি যা করেছ সব শেষ হয়ে যাবে। প্রায় অভিসম্পাত!' (৫ মার্চ ১৯৭২-এ নেওয়া সাক্ষাৎকার। 'বঙ্গাদর্শন', জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০০৪, ক্রোড়পত্র, পৃ. ১৭)

বিনোদবিহারী যে নন্দলালের আওতায় বা প্রভাবের বাইরে থাকতে, তাঁর কথায় 'তাই আমার liKe spoilt children যে যেমন পারলাম চরে খেলাম', এটাই তাঁকে এক নতুন দিগদর্শন মেলে ধরতে সাহায্য করেছেন।

নব্য-ভারতীয় ঘরানার সম্পর্কে বিনোদবিহারী সব সময়ই একটু সন্দিগ্ধ ছিলেন। এর আঙ্গিকগত সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। সত্যজিতের কাছে পূর্বোক্ত সাক্ষাৎকারে বলেছেন:

> 'এখন Havell যেটাকে বলতেন Calcutta School , সেটা really ক-দিন বাদে হয়ে গেল Jorosanko School । এবং তারপর সেটাকে patronise করলেন, যেটা তার সবচাইতে উপকার এবং সবচাইতে ক্ষতি করল, সেটা হল রামানন্দবাবুর publicity। ওরা কোনো technical জিনিস কিছু দেখে নি। অর্থাৎ অবনবাবু যেটা করেছেন, Indian Art বলতে সেটাই final।' ('বঙ্গদর্শন, জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০০৪, ক্রোড়পত্র। পৃ. ১৬)

বিনোদবিহারী তথাকথিত এই 'Indian Art' -এর সীমাবদ্ধতা থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছেন। সেটাই ছিল তাঁর শিল্পীজীবনের প্রকল্প। কিন্তু তিনি স্বদেশচেতনাকে উপেক্ষা করেন নি। আঙ্গিকে প্রাচ্য - উত্তরাধিকারের একটা বলিষ্ঠ পাদপীঠ তৈরি করতে চেষ্টা করেছেন। সেই প্রকল্পে তিনি সফলও হয়েছেন। যেভাবে তাঁর উত্তরসূরি ১৯৪০-এর দশকের অন্য অনেক শিল্পী পাশ্চাত্য আধুনিকতার আঙ্গিক আত্মস্থ করতে চেয়ে প্রথম পর্বে অসমন্বিত রূপকল্পের দ্বন্দ্বে সমস্যাক্রান্ত হয়েছেন, বিনোদবিহারী সেই পথ পরিহার করে আধুনিকতার এক স্বতন্ত্র পথ নির্মাণ করেছেন। তাঁর আত্মচেতনা, তাঁর নির্জনতার বোধ, প্রকৃতির গহন সৌন্দর্যের প্রতি তাঁর একনিষ্ঠ ভালোবাসা, তাঁর দৃষ্টিশক্তির সীমাবদ্ধতা থেকে সঞ্জীবিত অন্তর্চেতনা— এসব তাঁকে এক আধ্যাত্মিক সংবেদন দিয়েছে। সেই সংবেদন থেকেই তিনি গড়ে তুলেছেন নিজস্ব দৃশ্যভাষা, আধুনিকতার বিশেষ এক অভিজ্ঞান। আধুনিক যুগে বিশ্বশিল্পের ক্ষেত্রে এটাই তাঁর বিশেষ অবদান।

ন্যাশনাল গ্যালারির পূর্বাপর প্রদর্শনীর স্মারকগ্রন্থটি এভাবেই তাঁর সামগ্রিক অবদান বুঝতে আমাদের সাহায্য করে।